Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501032 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Travel or Life: A Review of the Novel 'Srikanta'

ভ্রমণ না জীবন : 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পর্যালোচনা

Dr. Rakesh Jana
Assistant Professor
Bengali Department, Medinipur City college
West Medinipur

Received on: 27th April 2026
Accepted on: 15th May 2026

Abstract:
Srikanth is not a travelogue; because it does not have what a travelogue contains. It does not have the history of travel, the history of people-armies, the history of carriages and palanquins; there is no external description of the place and environment according to time, nor does it present social interactions with people. In this, Srikanth seems to have discovered his inner world. Therefore, Srikanth is more than a travelogue; Saratchandra's autobiography is more than a story of Sri-kanth's unfolding and journey through the inner world. Except for the speaker, no one else could be the center of the garland of memories. The events of this novel are like complete sketches themselves. In fact, Saratchandra's intention is not to give a lasting impression by holding on to any continuous event or character. Although the first part of Srikanth captures some of the childhood and adolescence of the main character Srikanth, the full life of Srikanth is not captured here. Then again, characters like Indranath, Annadadidi, and even Piari Baiji are nothing more than strong impressions of Srikanth's memory. Many of them do not have even the slightest connection with the subsequent course of events. In discussing the novel, they should be considered together as a novel. In the novel, Srikanth narrates his autobiography from his childhood in the voice of a good man. As the sto-ry progresses, it is not difficult for the reader to understand that behind the veil of Srikanth, Saratchandra has written the novel based on elements of his own life. Saratchandra spent his childhood in his relatives' house (Mama's house) on the banks of the Ganges in Bihar, got drunk, hunted, studied music, was in the compa-ny of a baiji, became a monk, lived in Myanmar (Burma in Saheb's speech) for a long time, etc., which prove that his work is an autobiographical novel.

Key Words:
Srikanth, travelogue, autobiography, autobiographical novel

মূল প্রবন্ধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সাহিত্য রচনা শুরু করেন তার পূর্বে বাংলাদেশে ১৯০৫ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বইছে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এসে এই ঝড় কিছুটা স্তিমিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশে যুবক সমাজের মন তখন সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতায় হতাশায় আচ্ছন্ন। এই হতাশা এরপর থেকে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরপর ১৯১৪তে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী দেশে তখন প্রত্যাবর্তন করেছেন। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য শাসনের অধিকারের প্রতিশ্রুতি নিছকই ছলনায় পর্যবেসিত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় ভারতবাসীরা তখন নব উদ্দীপনায় মেতে

© Santiniketan Sahityapath

উঠেছে। এরপর অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ হিংসাত্মক হয়ে উঠলে গান্ধীজী আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দেন। ফলে যুব সমাজে দ্বিগুণ হতাশা ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। এরপর এলো বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়, তীব্র বেকার সমস্যা। এই সব কিছুই যুবসমাজের চিত্তে একটা অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা নিয়ে এলো। শরৎসাহিত্যের যুগসময় মূলত এই কাল। তবে একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে স্বদেশি যুগে শরৎচন্দ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছিলেন না, ছিলেন বার্মা মুলুকে। মোটামুটিভাবে ১৯০৩-১৯১৬ মে অবধি তিনি বাংলাদেশে ছিলেন না। তবে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২০ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কথিত আছে সমতাবেড় নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের জনৈক জমিদার মোহিনী ঘোষালের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ নিয়ে তিনি শিবোত্তর জমি দখলকে কেন্দ্র করে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা লড়েছিলেন। শুধু কৃষক বন্ধু রূপে জমিদারের বিরুদ্ধে নয়, হাওড়ার গাড়েনরিচে এ. জে. মেইন নামক বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘটেও তিনি সহায়তা করেছেন। এছাড়াও হাওড়ার মেথর ও ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটের মীমাংসাও তিনি করেছেন। তাই এই সময় যুব সমাজের অস্থিরতা ও বেদনার সঙ্গো তিনি পরিচিত ছিলেন না এমন নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — “তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] উপন্যাস... আমাদের মনোজগতের রহস্য উদঘাটন করিয়া, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মচেতন নরনারীর সৃষ্টি করিয়া বর্তমান যুগের জীবনযাত্রার সমস্যা-জর্জরিত বেদনাময় রূপটি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে একেবারে সমগ্র জীবনব্যাপী আধুনিকতার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।”[১]

শরৎ-সাহিত্য আসার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবে অভিজাত, উচ্চবিত্ত ও কখনো কখনো মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের দ্বারা শাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত গ্রামীণ ভূম্যধিকারী শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর নায়ক-নায়িকারা কদাচিৎ অন্য সমাজ থেকে আহূত হয়েছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চিত্র-চরিত্রের নির্বাচনে গ্রাম্য সমাজ সেভাবে প্রাধান্য পায়নি যতটা পেয়েছে শহুরে উচ্চবিত্ত সমাজ। তাঁর ‘চোখের বালি’, ‘গোরা’, ‘চতুরঙ্গ’ (‘ঘরে-বাইরে’ ও ‘যোগাযোগ’ বাদে) শেষের সবকটি উপন্যাসে রয়েছে নাগরিক উচ্চশিক্ষিত বিত্তসচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজচিত্রণের অভাব পূর্ণ করেছে।

তা যাই হোক “শরৎচন্দ্রই প্রথম লেখক, যিনি সজ্ঞানে সচেতন বাংলা উপন্যাসের এ যাবৎ অনুসৃত আভিজাত্য ও উচ্চবিত্তের মূল্যবোধ ভেঙে তার মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার আবাহন করলেন এবং সে মধ্যবিত্ত মানসিকতাও নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয়, একান্ত গ্রামকেন্দ্রিক ও গ্রামজীবী মধ্যবিত্ত মানসিকতা। উপরে জমিদার শ্রেণি ও নিচে শোষিত ও অবজ্ঞাত স্তরের একাধিক শ্রমজীবী শ্রেণি, যথা কৃষক, মজুর, বর্গাদার চাষী ও ভূমিহীন নিঃস্বের দল — এই দুই প্রান্তীয় সীমার স্তরে যে অগণিত সাধারণ মানুষ গ্রাম সমাজে বিরাজ করে এবং ‘ভদ্রলোক’ রূপে কথিত হয়, তাদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট নর-নারী চরিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই শিল্পরূপের আধারেই।”[২] তবে আমাদের ভুললে চলবে না তাঁর শিল্পদৃষ্টি একান্তভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি তা ওই স্তরের গণ্ডী ছাপিয়ে নিঃস্ব সমাজের বিত্তের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘বিলাসী’ প্রভৃতি ছোটোগল্প — ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেনা-পাওনা’, ‘শ্রীকান্ত’ ৩য় পর্ব ও ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে শ্রমিক ব্যারাকের চিত্রায়নে এই সমাজের জন্য তাঁর কারুণ্য বা বেদনা প্রকাশিত। অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় বলেছেন — “শরৎচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যিক যিনি ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রামের সঙ্গো আমাদের পরিচয় ঘটালেন।”[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল না ফলায় মোহভঙ্গোর বেদনা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই কালপর্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটিকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ‘শরৎ-সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ’ গ্রন্থে — “নিয়মিত অর্থ যোগানের স্থায়ী জীবিকাকে ঘিরে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ, উন্নততর জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা লাভ, এই ছিল নতুন সমাজকে ঘিরে গড়ে ওঠা মানুষের প্রত্যাশার কয়েকটা দিক। এ বিষয়ে মোহ জন্মেছিল যাদের বেশি, মোহভঙ্গোর বেদনা তাদেরকেই পোয়াতে হয়েছে বেশি করে। পরাধীন ভারতের অর্ধ-পুঁজিবাদী সমাজের স্তন্যরসপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথাই আগে এসে পড়ে। এই সমাজেরই গর্ভজাত সন্তান শ্রমিক শ্রেণি, মধ্যবিত্তের মতো দত্তক সন্তান (adopted son) এদের বলা চলে না। শ্রমিক জীবনে এই মোহাবেশের দাগ আদৌ স্পষ্ট নয়, তাই প্রত্যাশা হানির অভিজ্ঞতাকে তারা পেরেছিল অনিবার্য পাওনা হিসেবে মেনে নিতে, তা মধ্যবিত্তরা পারেন নি। শ্রমিকের মোহাবিষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল না, তার উপরে ছিল না স্বপ্নবিস্তারের অনুপ্রেরক শিক্ষা-দীক্ষা। ইংরেজদের ভেঙে দেওয়া নড়বড়ে অর্থনীতি (কৃষি)

© Santiniketan Sahityapath

থেকে বেরিয়ে আসার আচম্বিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে নয়া অর্থনৈতিক চুক্তির শরিক হয়ে গিয়েছিল মধ্যবিত্তরা। এর ভালোমন্দ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ ছিলনা তাদের জীবনে। মোহ না থাকায় খোলা চোখে এই ব্যবস্থাকে দেখার দৃষ্টি ছিল শ্রমিক শ্রেণির, সাধ্যমত প্রতিকূলতাকে ডিঙানোর চেষ্টাও তাদের দিক থেকে শুরু হয়েছিল অনেক আগে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পালকি-বেয়ারা, রজক, গোপ, নমঃশূদ্রদের অর্থনৈতিক ধর্মঘটের খবর মিলবে ইতিহাসে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের সামাজিক সেবার সঙ্গে যুক্ত এই শ্রেণির মানুষেরা মজুরি বৃদ্ধি বা উপার্জন সমস্যার দূরীকরণে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। গত শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করতে আরম্ভ করেছে। রেলওয়ে ধর্মঘট, স্পিনিং ও কটন মিলের শ্রমিকদের ধর্মঘটে নামতে দেখা গেছে ছয় থেকে আট এর দশকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্ন তো শিল্প ধর্মঘটে বেশ সোচ্চার।... ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ভেঙে পড়ার ঘটনা শ্রমিক শ্রেণিতে মিলবে না।

"প্রতিষ্ঠাকামী মধ্যবিত্তের চেহারা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রমিক শ্রেণির এইসব ধর্মঘটকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরা disturbing বলে মনে করে এসেছেন, ভদ্রগোছের উচ্চ বা মধ্যশ্রেণির চাকুরি সংখ্যা, সীমিত না হয়ে আসা পর্যন্ত এই সামাজিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে এঁরা শ্রেয়োবোধের ধারণাই পোষণ করেছেন। মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গের কোনো সাহিত্যিক লক্ষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই এর দশকেই এ বিষয়ে মানসিক আলোড়ন ধরা পড়তে থাকে সাহিত্যে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বিলম্ব চেতনা ঠিক প্রার্থিত না হলেও এর কার্যকারণ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।"[৪]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে শরৎসাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয় একান্ত রূপেই গ্রামকেন্দ্রিক, গ্রামজীবী মধ্যবিত্ত মানসিকতা। তাই গ্রামকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মোহচ্যুতির বেদনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রভাব একেবারেই কম। তাই এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া শরৎসাহিত্যে অল্পই রয়েছে।

সমাজে পরশ্রমজীবী জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ উৎপীড়ন যে কত নির্মম ও নগ্ন ছিল এই কঠিন বাস্তবকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'এ সমাজের শোষক ও শোষিত শ্রেণির নিখুঁত চিত্র বর্তমান। গ্রামে অর্থের প্রয়োজনেই কখনো কখনো এই জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। আসলে তাঁদের জমিদারি পরিচালনা করেন গোমস্তা নায়েব, পাইক পেয়াদা, কর্মচারী ও ভৃত্যরা। সুতরাং গ্রামে প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে এই মধ্যবর্তী শ্রেণির মারফতই খাজনা আদায় হয়। ফলে এই সব কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণে কৃষকপ্রজা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বাংলার জমিদার গ্রাম থেকে শহরমুখী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে, আর উপস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র কায়েম করলে প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থ সূচিত হয় না উল্টে শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে 'অনুপস্থিত জমিদার' (Absentee Landlord) সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। তাঁর 'দত্তা' উপন্যাসে জমিদার বনমালী গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস করেছেন ব্যবসার প্রয়োজনে। তিনি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের জমিদারীও অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তিনি জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ম্যানেজার রাসবিহারী প্রবল শাসনে চাষীদের দুঃখের অভাব ছিল না। 'অনুরাধা' গল্পে নতুন জমিদার হরিহর ঘোষাল কলকাতাবাসী, তিনি কাঠের ব্যবসায় লক্ষপতি হয়েছিলেন। 'শেষের পরিচয়' গল্পে ব্রজবাবুর দেশে জমিজমা তথা ছোটোতালুক ছিল। এর সঙ্গে তিনি কলকাতায় কী একটা কারবারও করতেন। 'বড়দিদি' উপন্যাসে জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ির বসবাস ছিল কলকাতায়। তাঁর বিপুল সম্পত্তি, প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও তাতে রীতিমত সাহেবী ধরণে সাজানো আসবাবপত্র যে গরিবদের শোষিত টাকায় হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'বোঝা' গল্পে সাগরপুরের জমিদার হরদেব মিত্রও কলকাতায় বাস করেন। 'জাগরণ' উপন্যাসে ব্যারিস্টার মিস্টার রাধামোহন রায় পশ্চিমের শহরে বাস করতেন, কিন্তু বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে তাঁর জমিদারী ছিল। তিনি কোর্টে প্রাকটিস করতেন না তাই তাঁর যাবতীয় খরচ জমিদারি থেকেই আসতো। এই উপন্যাসে মিস্টার আর. এম. রে-র কন্যা আলেখ্য জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে জমিদারি সেরেস্তার খরচ কমাতে বৃধ্ব তের টাকা বেতনের কর্মচারী নয়ন গাঙ্গুলিকে ছাঁটাই করে। দরিদ্র নয়ন গাঙ্গুলি বিধবা মেয়ে ও নাবালক নাতি নিয়ে কীভাবে গ্রাসাচ্ছাদন করবে এই ভেবে আলেখ্যর কাছে ছাঁটাই না করার কাতর আর্জি জানিয়েছে। অথচ 'তাঁহাদের সভ্য-সমাজের কতদিনের উৎসব, কত আহার-বিহার, গানবাজনার আয়োজন, কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত গাড়ি-ঘোড়া, ফুলফল, কত মিথ্যা আড়ম্বরের' আয়োজনে জমিদার কত টাকা খরচ করছেন। 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাসের পিতার মৃত্যুর পর জমিদারির অংশ দেবদাসের

 © Santiniketan Sahityapath

নামে আসে। দেবদাস গ্রামে না থেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে জমিদারীর বিস্তর টাকা খরচ করে। 'শ্রীকান্ত' (১ম খণ্ড) জমিদার কুমার সাহেবও জমিদারী থেকে লব্ধ অর্থে নাচ-গান, বাঈজী ও শিকার করতে ব্যয় করেন। এই উপন্যাসেরই ৩য় খণ্ডে রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটি গ্রামের জমিদার কিন্তু শহরে থাকেন। 'শ্রীকান্ত' (৩য়) উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীও জমিদারি ব্যবস্থার কল্যাণে কিছু কালের মধ্যেই ধনশালী হয়ে উঠেছিলেন।

'শ্রীকান্ত' চারটি পর্ব মিলিয়ে (১ম ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় ১৯২৭, ৪র্থ ১৯৩৩) একটি সম্পূর্ণ বই। অনেকে চারটি পর্বকে পৃথক পৃথক উপন্যাস বলে মনে করেন। কিন্তু উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে এদের একসঙ্গেই একটি উপন্যাস হিসেবে বিচার করে দেখতে হবে। উপন্যাসটিতে উত্তম পুরুষের জবানীতে বাল্যকাল থেকেই আত্মজীবনী শুনিয়েছে শ্রীকান্ত। কাহিনি এগোতে থাকলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে শ্রীকান্তের আড়ালে শরৎচন্দ্রই তাঁর নিজের জীবনের উপাদান নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। শরৎচন্দ্র বিহারের গঙ্গাতীরে আত্মীয়বাড়িতে (মামাবাড়ি) ছোটবেলা কাটান। তাঁর নেশা করা, শিকার করা, সংগীত শিক্ষা, বাঈজী সঙ্গ, সন্ন্যাসী হওয়া, দীর্ঘকাল ধরে মায়নামারে (সাহেব জবানীতে বার্মা) বাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রমাণ করে দেয় তাঁর রচনাটি আত্মজৈবনিকমূলক উপন্যাস। শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্রের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপাদান বেশি থাকলেও উপন্যাসটির শিল্পরস অক্ষুণ্ণ রয়েছে। 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জানা যায় ইন্দ্রনাথ চরিত্রের পেছনে রয়েছেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু রাজেন মজুমদার। দেবানন্দপুরে পাঠশালায় পড়ার সময় এক সহপাঠিনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর এই প্রণয়ী বোধ হয় দেবদাসের পার্বতী ও শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী। অনেকে মনে করেন রাজলক্ষ্মী চরিত্রের পেছনে দেবানন্দপুরের কায়স্থ পরিবারের কিশোরী কন্যা কালিদাসী। অনেকে বলেন শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে তিনজন মহিলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসছিলেন — গায়ত্রী দেবী, শান্তি দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী। তাই তাঁর রাজলক্ষ্মী চরিত্রের পেছনে অনেকের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। "ক্যাম্বিসের খাটে শুয়ে আছেন পিশেমশায় নয় দাদামশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য — রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। ছোড়দা এবং যতীনদা দুজনেই মামা গল্পের খাতিরে দাদা হয়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরি সিং তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তো সুর করে। টিকিট বিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বউরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পের রসান আছে।"

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এক একটি পরিচ্ছেদের সমষ্টি। অনেকটা এপিসোডিক। শ্রীকান্তের জীবন পরিক্রমার ইতিবৃত্ত। পথ চলতে চলতে শ্রীকান্ত নানা ঘটনার আবর্তে অসংখ্য নর-নারীর সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা তার জীবনের মহা মূল্যবান সম্পদ। লেখকের এই বিশ্বভ্রমণে আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাগুলিকে বড্ড অগোছালো মনে হলেও সংযোগচ্যুত হয়নি। লেখক নিজেই বলেছেন — "লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময় আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এইসব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন পরিপাটি ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া তো তাহার একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।" শরৎচন্দ্রের এই স্বীকৃতিতেই পরিষ্কার যে শ্রীকান্তের কাহিনি এলোমেলো বা বিক্ষিপ্ত নয়; শ্রীকান্তই এই কাহিনির সংযোগবিন্দু।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখতে গেলে দুটি বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। যথা প্রথমত, পারম্পর্য রক্ষা করে মূল অনুযায়ী ঘটনাসমূহ বিন্যস্ত করা। দ্বিতীয়ত, নিরাসক্ত ভাবে আত্মসমীক্ষায় লিপ্ত হওয়া। এই দুই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে শ্রীকান্ত চরিত্রকে আশ্রয় করে ঘটনাবলি আবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানান চরিত্ররা তাদের কক্ষপথ ঘুরে কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকান্তের উপর আলোকপাত করে। তবে এটাও ঠিক যে শ্রীকান্তের অব্যাখ্যাত অস্পষ্ট আচরণ ও ঔদাসীন্য এই দুর্বল পলায়নি মনোবৃত্তি দ্বিতীয় ভাগের কাহিনিকে দুর্বল ও শিথিল করেছে। অনেকে মনে করেন শ্রীকান্ত ভ্রমণ কাহিনি নয়; কারণ ভ্রমণ কাহিনিতে যা থাকে এতে তা নেই। এতে ভ্রমণের ইতিহাস, লোক-লশকর, গাড়ি পালকি নিয়ে চলার ইতিহাস নেই; স্থান ও পরিবেশের সময় অনুযায়ী বাহ্যিক বর্ণনাও নেই, মানুষের সঙ্গে সামাজিক আলাপও এতে পরিবেশিত হয় না। এতে শ্রীকান্ত যেন আপন অন্তরলোককে আবিষ্কার করেছে। সুতরাং শ্রীকান্ত ভ্রমণকাহিনি অপেক্ষা; শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী অপেক্ষা শ্রীকান্তের ক্রমউন্মোচন ও অন্তরলোকের পথ-পরিক্রমার কাহিনি। একমাত্র বক্তা ছাড়া আর কেউই এতে স্মৃতি চিত্র মালার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেন নি। এই উপন্যাসের ঘটনাগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্কেচের মতো। আসলে একটানা কোনো ঘটনাকে বা চরিত্রকে ধরে স্থায়ী ইম্প্রেশন দেওয়া শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে মূল চরিত্র শ্রীকান্তের বাল্য, কৈশোর জীবনের কিছুটা অংশ ধরা দিলেও শ্রীকান্তর পূর্ণ জীবন এখানে ধরা দেয়নি। তারপর আবার ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, এমনকি পিয়ারী বাইজি প্রমুখ চরিত্রগুলিও শ্রীকান্তের স্মৃতির জোরালো ইম্প্রেশনের বেশি কিছু নয়। পরবর্তীকালে ঘটনাস্রোতের সঙ্গে অনেকের তাতে যোগাযোগের লেশমাত্রও নেই।

© Santiniketan Sahityapath

পূর্বেই বলেছি এই উপন্যাসটি এপিসোডধর্মী। শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ এপিসোডে আমরা দেখতে পাই ফুটবল মাঠে মারমুখী জনতার হাত থেকে শ্রীকান্ত-কে উদ্ধার করার পর ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গো শ্রীকান্ত মুগ্ধচিত্ত। সে গভীর রাতে সাপ-খোপের ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাঁশি বাজিয়ে দুর্গম পথে ঘুরে বেড়ায়। এই বিচিত্র কর্মকাণ্ড ছাড়াও তার নির্ভীক চরিত্রের পরিচয় পাই শ্রীনাথ বহুরূপীর রহস্য মোচনে। "সেকালের বাস্তব জীবনের এক টুকরো ছবি এর মধ্যে আছে — বহুরূপীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিনয় দেখাবার লোক-বিনোদন, তেমনি গম্ভীর কর্তা-ব্যাক্তিদের ভীতি এবং মিথ্যা আস্ফালন ব্যঙ্গ ও কটাক্ষের বিষয় হয়ে উঠেছে।"[৫] বর্তমানে এই বহুরূপীদের জীবিকা মৃতপ্রায়। শুধুমাত্র গাজন ও দশেরা উপলক্ষে গ্রাম ও শহরে মাঝে মধ্যে এদের লক্ষ করা যায়। আসলে যন্ত্রসভ্যতা লোক-বিনোদনের আধুনিক উপকরণ নিয়ে এলে এই বিনোদন তাদের কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। শ্রীনাথ বহুরূপীরা এভাবেই লুপ্ত হতে থাকে।

ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের মাছ চুরি এপিসোডে এসেছে অন্নদাদি ও সাপুড়ে শাহজির লোক-ঠকানো বৃত্তির প্রসঙ্গ। এই অন্নদার স্বামী শাহজী লম্পট, খুনের আসামী, সে সাপুড়ে হয়েছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। অন্নদাও সব জেনেশুনে সাপুড়েবেশী স্বামীকে চিনতে পেরে কাউকে না জানিয়ে স্বামীর সহগামী হয়। এই শাহজী ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে টাকা হাতানোর জন্যই ইন্দ্রকে সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র শেখাবে বলে আশ্বাস দেয়। আসলে সাপুড়েদের সবটাই বুজরুকি, লোক ঠকানোর কৌশল। অন্নদাদির মুখেই এই সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায় — "সাপুড়ের কড়িচালা, ঘরবন্ধন, দেহবন্ধন, ধুলো-পড়া এইসব মন্ত্র শুধু লোক দেখানো ঠগবাজী। অন্নদা তাই ইন্দ্রকে বলেছে- আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িও না। আমরা তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়া বাঁচতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।"[৬] আসলে সাপুড়েরা যে সাপ ধরে তা শুধুমাত্র হাতেরই কৌশল, মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নয় — এই কথা শরৎচন্দ্র তাঁর 'বিলাসী' গল্পে (১৯১৮) চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয়ও ধর্মত্যাগী হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। সেও সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে শ্বশুরের সাপুড়ে পেশাটাকেই বৃত্তি বানিয়েছিল। এখানেই জানতে পাই — "সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবা মাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত, যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড় দেখানো হোক, আর একটা কাঠিই দেখানো হোক, সে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না।"[৭] মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী বিলাসী এই লোক ঠকানো ব্যবসার বিরুদ্ধাচরণই করেছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সে কথা কানেই তোলেনি। ফলে হঠাৎ একদিন মৃত্যুঞ্জয় বিষধর সাপ ধরতে গিয়ে, সাপের ছোবল খায় ও সমস্ত মন্ত্র, তাবিজ — মহৌষধি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। এই গল্পে শরৎচন্দ্র বড়ো রকমের শিক্ষা দিয়ে যান — কুসংস্কার মোচনের। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও শাহজীর মৃত্যুও সর্প দংশনেই ঘটে। শাহজীকে এখানে ঠগ-প্রবঞ্চক হিসেবে দেখালেও অন্নদা চরিত্রটির মহত্ত্ব তার স্নেহপ্রবণচিত্ত; সে ইন্দ্রনাথের ক্ষতি দেখতে পারেনি। সে গরীব, নিজে ঘুঁটে বেচে কাঠ কুড়িয়ে স্বামীর গাঁজার পয়সা যোগাড় করত। তাই শাহজী যখন ইন্দ্রের কাছে বড়ো রকমের টাকা-পয়সা হাতানোর ছক কষেছে তখনি অন্নদা ইন্দ্রকে সমস্ত সত্যি জানিয়ে তাকে বড়ো রকমের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করেছে। এর জন্য স্বামীর কাছে মার যেমন খেয়েছে, স্নেহের ইন্দ্রও তাকে ভুল বুঝে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করেছে। সাপুড়ে সমাজ জীবন চিত্রণে শরৎচন্দ্র এখানে অনবদ্য। ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (৩) গ্রন্থে বলেছেন — "বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম একজন উল্লেখযোগ্য লেখক সাপুড়ে জীবন পরিবেশটি তার রূঢ়তায় দারিদ্র্যে সাপ বশের বিদ্যায় এবং মিথ্যে হামবড়াইতে ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্র শুধু মধ্য ও উচ্চবর্গের বাঙালি-জীবনের শিল্পী নন, সমাজের অন্ত্যজ মানুষের স্তরে তিনি যে প্রায়ই নেমে এসেছেন এ জাতীয় প্রসঙ্গাগুলি তার নিদর্শন।"[৮]এই উপন্যাসে শাহজী হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই চরিত্রটি বাঙালি মুসলমানদের ঐ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করেছে কিনা একথার মীমাংসায় না গিয়ে বলা যায় পরবর্তীকালে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই হিন্দুধর্ম ত্যাগী মুসলমান সাপুড়ে সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র নীতিধর্মকে জীবনের মূল্যে যাচাই করতেন। সমাজের শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ব্যাক্তি আদর্শ ও নীতিধর্মের চাপে মাথা নত করলে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করতেন; যে সমাজধর্ম মানুষকে ও মানুষের হৃদয়কে নির্মমভাবে নিপীড়িত করে তার মূল্য কোথায়? শ্রীকান্তের অন্নদাদিদি ও অভয়া মানুষ হিসেবে সহ্যশক্তি ও পাতিব্রত্যের এক দীপ্ত রূপ। তাই তো শরৎচন্দ্র দেবতার কাছে আবেগাতুর হয়ে প্রশ্ন করেন — "ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী — সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মীণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া, সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি।... কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড়

বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন?... যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী সতীর সঙ্গেই — তাঁকে তাঁর বাপ, মা আত্মীয়স্বজন, শত্রু, মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া? ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?" আসলে শরৎচন্দ্রের মধ্যেই আমরা বাঁধা ছকের বিপরীতে সহানুভূতি ও সমানুভূতি খুঁজে পাব।

শ্রীকান্ত ভালো শিকারী ও গানের সমঝদার শ্রোতা। বিহারের জমিদার বন্ধু কুমার সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর তাঁবুতে এসেছে। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে ১৯০২ সালে শরৎবাবু জনৈক মহাদেব সাহুর বাড়িতে গায়ক ও বাদকের চাকরি গ্রহণ করেন। এই মহাদেবেরই বিশিষ্ট বন্ধু উকিল শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুজাফফরপুরের বাড়িতে অতিথি হিসেবে প্রায় দু'মাস ছিলেন। আসলে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কুমার সাহেব চরিত্রটি যে মহাদেব সাহুর আদলেই তৈরি একথা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এখানেই পরিচয় হয় পিয়ারী বাইজির সঙ্গে, যে কিনা একদা শ্রীকান্তের বাল্যসঙ্গিনী ছিল। "এই বাঈজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঈজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ — এবং গান গাহিতে জানে।"[৯] তখনকার সময়ে ধনীগৃহে কিংবা তাদের বাগানবাড়িতে বাইজিদের আগমন ঘটত। তাদের সুমধুর কণ্ঠ ও নৃত্যের আনন্দ নেবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিবর্গেরও আগমন ঘটত। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' গল্পে এই শ্রেণির পরিচয় রয়েছে। বর্তমানে এই জীবিকাটি লুপ্তপ্রায়। তা যাই হোক এই পিয়ারী বাইজির সঙ্গে নানা চরিত্র এসেছে তার খানসামা রতন প্রামানিক, তবলাবাদক ছট্টুলাল, আর দারোয়ান। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে রূপসী নারীর রূপ বর্ণনায় বরাবরই মিতবাক সংযত ও দ্বিধান্বিতও বটে। তিনি জানতেন নারীর রূপ বর্ণনা ও নিসর্গ বর্ণনা শিল্পীর কবিত্বশক্তিকে প্রশংসা করে কিন্তু তা উপন্যাসের বস্তুধর্মিতার বিরোধী। তাই তিনি নারীর বাহ্যিক রূপ বর্ণনায় আগ্রহ না দেখিয়ে অন্তরের সৌন্দর্যময় দীপ্তি গুণ বর্ণনায় বেশি উৎসাহী। তবে কিছু ক্ষেত্রে নারীর রূপ বর্ণনাতেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন — "রূপ বর্ণনার জন্য কোন আয়োজন নেই, কোন আড়ম্বর নেই, ক্রিয়া ও কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সংযত তুলির দু-একটি আঁচড়ে হয়তো কোন নারী চরিত্রের রূপ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ আলোকের মতো ঝলসে ওঠে। সেই বর্ণনা পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে মিশে থাকে এবং তা অকারণে আনা হয় না, নিকটবর্তী কোন পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিস্ময় ও চাঞ্চল্য জাগাবার উদ্দেশ্যেই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানরূপেই তাকে স্থান দেওয়া হয়।"[১০] 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রূপসী পতিত চরিত্র রাজলক্ষ্মীর অন্তরালে তার শুদ্ধ পবিত্র ব্যক্তিত্বের বর্ণনাও শরৎচন্দ্র অনুকম্পার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন — "গঙ্গার ঘাটে পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্তচন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নতুন রাঙা বারানসি শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরা সোনালি রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহারা মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে।"

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ২য় পর্বে শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রা পর্বে জাহাজে নন্দ মিস্ত্রী ও টগরের প্রসঙ্গ রয়েছে। অভয়া কাহিনির সূত্রপাতও এই জাহাজেই। জাহাজে বহুমানুষ কর্মের সন্ধানে বার্মা চলেছে, এদের মধ্যে কেউ বা বার্মা মুলুকে কাজ করে। এদের মধ্যে কেউ মিস্ত্রী, কেউ দর্জি, কেউ বা শ্রমিক। জাহাজের কর্মী হিসেবে যেমন রয়েছে কুলি খালাসীর দল, তেমনি রয়েছে ডাক্তার, ক্যাপ্টেন ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা। জাহাজে শুধু বাঙালি বা হিন্দুস্থানী নয় বিদেশিরাও (চিনা) বার্মা মুলুকে কর্মের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছে যদিও শরৎচন্দ্র ফলাও করে বার্মার জীবনের কথা বলতে বসেন নি। কিন্তু শ্রীকান্তের বার্মা বাসকালীন পর্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি জীবনের পরিচয় আভাসে ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষের কর্মসমস্যাই বাঙালি তথা ভারতীয়দের বার্মামুলুকে গন্তব্যের একমাত্র কারণ। বার্মামুলুকে পরিশ্রম করলে অর্থ উপার্জন করা যায় বটে তবে এই মুলুকে চাকরির ছড়াছড়ি — এই মিথ্যাচারের খোলসা করেছে শ্রীকান্ত নিজেই। শ্রীকান্তের জবানীতে এই প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে — "... তাঁর কোন এক আত্মীয় বার্মামুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে — শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙালিদের সাহেবরা কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয় — এইরূপ অনেক কাহিনি। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই।"[১১] শরৎচন্দ্রের বার্মায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই ইতিহাস 'শ্রীকান্ত' (২য়) না থাকলে ওই রকম আকাশ কুসুম কল্পকথায় হয়তো আমাদের বিশ্বাস করতে হতো, প্রকৃত সত্য অজানাই থাকত। শ্রীকান্ত বার্মায় পৌঁছে দেখেছে, এখানে বিপুল পরিমাণে বাঙালিরা হয়

কুলি, গাড়োয়ান, কেরানি, দর্জি, তেল-কাঠ-চুরুট কারখানার শ্রমিক হিসেবে চাকরি করেছে; নয়তো খাওয়া ও থাকার হোটেল খুলে বসেছে। ভদ্র চাকরিতে বাঙালিরা খুব কমই নিযুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের জাতি-বর্ণভেদের সংস্কার বিদেশ বিভুঁইয়ের কর্মক্ষেত্রে এসে কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে তার ব্যঙ্গাচিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। বার্মাতে অবস্থিত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের তিনি 'combined hand' বলেছেন, অর্থাৎ — "... পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজী কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুর যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালি বামুনদের আজিও একাজে রাজি করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয় শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত অবস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা — একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।"[১২]

এই সব খণ্ড খণ্ড এপিসোডিক ঘটনা ছাড়াও বার্মা বাসকালে প্লেগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লে বাঙালি প্রবাসী চাকুরীজীবীদের মধ্যে যে প্যানিক বা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে শরৎচন্দ্র তা বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই আতঙ্কে অনেকে চাকুরি তথা ব্যবসা ছেড়ে দেশে পালিয়েছে। শ্রীকান্তের বার্মা ছেড়ে আবার দেশে প্রত্যাবর্তণের পর শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর একসঙ্গে রেলযাত্রার সময় ছা-পোষা কেরানি যাত্রীটির মেয়ের জন্য পুতুল কিনে বর্ধমান নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি আমরা যেন আজও হামেশাই দেখি। এই সময় শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর কেরানির জীবনসমস্যা নিয়ে যে কথোপকথন হয় তা সমকালের কেরানিদের অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র তুলে ধরে — "বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি-এমনি। রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে — আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, খরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ — বাঙ্গালী কেরানী জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশ টাকার উপর। রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া, বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে। তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এঁদের চোদ্দ-আনা লোকের কিচ্ছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। ... ।"[১৩] রাজলক্ষ্মীর কাছে এই সংকটের চিত্র আরো পরিষ্কার করতে শ্রীকান্ত বলেছে — "... ত্রিশ টাকা ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"[১৪] উপরোক্ত অংশবিশেষ লেখকের সমকালীন কেরানীকুলের অর্থনৈতিক সমস্যার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠ হয়েছে।

এই অংশে অভয়া-রোহিণী বৃত্তান্তে অভয়া চরিত্রের রূপ বর্ণনায় তিনি বলেছেন — "সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি, কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি।... সিঁথায় সিন্দুর ডগডগ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা — আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙাপেড়ে শাড়ি।" এখানে লক্ষ করবো বসন, অলঙ্কারের আড়ম্বরহীন নারীর ব্যাক্তিত্বময়তার শ্রী পাঠকদের আকৃষ্ট করে। অর্থহীন, অপমানকর সতীত্বের চেয়ে একনিষ্ঠ প্রেম অনেক বড়ো একথা অভয়া-রোহিণী বৃত্তান্তের মূল কথা। অভয়াকে ভালোবেসে সব কিছু ত্যাগ করে রোহিনী রেঙ্গুনে এসেছিল, অভয়াকে একান্ত করে পাবার আশায়। কিন্তু অভয়া হলো সনাতন ধর্মের নারী। জন্ম থেকেই সে জেনে ও দেখে এসেছে, নারীর স্বামী ভিন্ন অন্য কোনো গতি নেই। রেঙ্গুনে এসে রোহিণী চাকরি করেছে, সন্ধ্যার পর টিউশনি করেছে কেবলমাত্র অভয়াকে পাওয়ার জন্য। এরপর সেই অভয়াই যখন স্বামীর সন্ধান পেয়ে স্বামীর ঘরে চলে যায়, তখন রোহিণীর তাকিয়ে দেখা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। তার তো আর অভয়ার স্বামীর মতো অধিকার নেই। হৃদয়ের এই ব্যথা নিয়ে রোহিণী ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই

দুঃখ, অপার ব্যথা বেদনা ও হাহাকারকে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে স্বামীর ঘরে গিয়েও অভয়া যে পাশবিক অর্ভ্যথনা পেয়েছে সেটাও দরদী শরৎচন্দ্র দেখাতে ভোলেন নি। অভয়ার স্বামী মানুষ নয়, পাষণ্ড। সেই স্বামীর বাসায় অত্যাচারিত হয়েও অভয়া রোহিণীর জন্য চিঠি লিখেছে শ্রীকান্তকে। শ্রীকান্ত বলছে, 'খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি — সে যে কতবড় দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরলচিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না।' এই অংশেই বোঝা যায় নারী পুরুষের সম্পর্ক কত বিচিত্র ও জটিল।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় পর্বে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সঙ্গে আমাদের নিয়ে গেলেন ভাগলপুর-পাটনা-রেঙ্গুন-কলকাতা থেকে দূরে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গামাটি গ্রামে। বীরভূমের এই রুক্ষ অঞ্চলে বাংলার পল্লীর পরিচিত জীবনলীলা চিত্রাঙ্কন করলেন। গ্রামটির বৈশিষ্ট্য এখানে সমাজ কথিত 'অচ্ছুত' সম্প্রদায় সাঁওতাল-ডোম-বাউরী সম্প্রদায়ের বাস এখানে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বাস প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বস্তুত, ঘর-দুই বারুজীবী এবং একঘর কর্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম ও বাউরীদের বাস বাউরীরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।"[১৫] শ্রীকান্তের আত্মকথনে এদের মর্মান্তিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক সংকটের কথা ব্যক্ত হয়েছে — "বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপনে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহ ও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙ্গালা দেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি জায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সত্গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমন ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।"[১৬] এই অবস্থা আজও যেমনকে তেমনি রয়ে গেছে।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর গঙ্গামাটি যাওয়ার পথে সেবাব্রতী সাধু ব্রজানন্দ ওরফে আনন্দের সঙ্গে কথোপকথনে দেশের কৃষকদের এই হীনতর অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্য জমিদারের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বসবাসকে দায়ী করা হয়েছে। কারণ জমিদার গ্রামে না থাকলেও খাজনা আদায়ের ভার জমিদারির মধ্যসত্ত্বভোগী নায়েব-গোমস্তাদের উপরই দিয়ে যায়, তাতেই প্রজাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। তাই গঙ্গামাটির জমিদার রাজলক্ষ্মীর প্রতি তার আবেদন — "এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেচে। যখন কাছে ছিলে তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েছ, দুঃখের ভাগও তেমন নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহর বাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান-দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার দিদি... ।"[১৭] আনন্দের এই কথাটা যে একেবারেই নির্ভুল তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রজানন্দের পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে সেবাব্রতী লোক শরৎ উপন্যাসে দুর্লভ নয়। 'বিরাজ বৌ'এর নীলকণ্ঠ, 'পল্লীসমাজ'এর রমেশ, 'পণ্ডিতমশাই'এর বৃন্দাবন, 'দত্তা'র নরেন, 'দেনাপাওনা'র ফকির সাহেব। এছাড়াও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে স্বয়ং শ্রীকান্তই সেবাব্রতীর ভূমিকা পালন করেছে।

আসলে সে সময় জমিদার মানেই ছিল প্রজাদের কাছে বিভীষিকাময় আতঙ্কের। কথায় বলে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'; জমিদারের চেয়েও জমিদারের উপসত্ত্বভোগীরা শোষণের মাত্রাটা চরম অবস্থায় তুলে প্রজাশোষণ করতেন। পরোক্ষে দোষ জমিদারের। রাজলক্ষ্মীর জমিদারির কর্মকর্তা ছিলেন কুশারী মশাই। তিনি সৎ লোক ছিলেন না, তাঁতিদের ঠকিয়েই তাঁর বাড়বাড়ন্ত। তাঁরই ভ্রাতৃবধূ সুনন্দা যখন জানতে পারে তাদের বিষয় সম্পত্তি সব এক তাঁতি পরিবারকে ঠকিয়ে অর্জিত তখনি সে স্বামী সন্তানকে নিয়ে পৃথক হয়ে এক জীর্ণ কুটিরে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। সুনন্দা ন্যায়পরায়ণ, প্রতিবাদী দুঃসাহস নিয়ে ও সর্বত্যাগী দারিদ্র্য বরণ করে প্রজাবিদ্রোহের প্রতিনিধি হতে পারতো। কিন্তু জমিদারের ধনী মহাজন কুশারী কর্তার প্রতারণার বিরুদ্ধে তার বিপ্লব অহিংস পন্থী।

তাই প্রজা বিপ্লবের সম্ভাবনা থমকে গেছে। তবে সুনন্দার প্রতিবাদ নীরব হলেও কার্যকরী। ভাসুর কুশারী কর্তার মনোভাব বদলের পেছনে তার অনড় অবস্থান প্রশংসনীয় যদিও এই মনোভাব বদলে দয়ার্দ্রচিত্ত জমিদার রাজলক্ষ্মীর গোপন হাত রয়েছে। তথাপি তাঁতিদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ও শ্বশুরের ভিটেতে সুনন্দার পুনঃঅবস্থানের সাফল্য যেন সুনন্দারই চারিত্রিক গুণাবলির জন্য সম্ভব হয়েছে। তাই উনিশ কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণা দুখঃজয়ী এই সুনন্দা এই উপন্যাসের আরো এক উজ্জ্বল প্রতিবাদী চরিত্র। শ্রীকান্তের ৩য় পর্বেই দেখা যায় রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত প্রেমের প্রশ্নে কখনো পরস্পরের কাছে এসেছে আবার কখনো দূরে সরে গেছে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেমের বাঁধনে ধরা পড়তে চাইলেও রাজলক্ষ্মী ধর্মাচরণের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে শ্রীকান্তের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্বেই দেখা যায় সাঁইথিয়া থেকে রেলের নতুন লাইন বসছে, তাই প্রচুর কুলি-মজুরদের সমাবেশ এই অঞ্চলে। গঙ্গামাটি গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরেই তাদের ক্যাম্প বসেছে। আলোচ্য পর্বে এসেছে শ্রীকান্তের বাল্যকালের বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজ ওরফে ব্যাঙ। সতীশ এখানে রেলওয়ে সাব ওভারসিয়ারের কাজ করে, কুলিদের তদারকি করাই তার কাজ। ওই ক্যাম্পে কলেরা মহামারীর রূপ নিলে সতীশ মারা যায়। শ্রীকান্ত সেখানে আক্রান্ত কুলিদের সেবা-শুশ্রূষার ভার নেয়। এখানেই সে এক কলেরা আক্রান্ত কুলি রমণীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তার "স্বামী নাই সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামের চা বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।"[১৮] সে সময় এই শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের এভাবেই বেশি মজুরির ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে চা বাগানের দালাল অর্থাৎ আড়কাঠিরা ধরে নিয়ে যেত এখানে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি চিত্র রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে একটি নির্মীয়মান রেললাইনের পাশে কুলিবসতি ও কলেরা মহামারীর প্রকোপ এপিসোডটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, "... পানীয় জলের অভাবে কলেরা-কুলি লাইনে তা মহামারী আকার ধারন করে। চিত্রটি বেশ জীবন্ত। শ্রীকান্ত উপন্যাসেই মহামারীর তিন তিনটে ছবি পেলাম। বিহারের আরা অঞ্চলে বসন্ত মহামারী প্রথম পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনে প্লেগ মহামারী। তৃতীয় পর্বে বীরভূমের গ্রামে কুলীলাইনে কলেরা মহামারী। পরবর্তী বাস্তববাদী লেখক তারাশঙ্করের গল্পগুলির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। সময়টা বিংশ শতকের প্রথমাংশ, বাংলার জীবনের একটা বাস্তব বিভীষিকা ছিল এই সব ব্যাধির ব্যাপক প্রকোপ। তাই বাংলা কথা-সাহিত্যের এই দুই সাহিত্যিক একে এত বিস্তৃতভাবে ধরেছিলেন।"[১৯]

কুলিদের ক্যাম্প ত্যাগ করে শ্রীকান্তের মামুদপুরে অবস্থানকালে পরিচয় হয় এক হেডমাস্টারের সঙ্গে। হেডমাস্টারের কথার সুরে বোঝা যায় রেলগাড়ি চালানোয় দেশের শান্তি চলে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রেল অর্থনৈতিক ভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে; কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে সেই অর্থে শ্রীবৃদ্ধি ঘটার বদলে বিদেশি প্রভুদের হাতে লাভের অঙ্ক চলে গেছে। এতে একপ্রকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিই পেয়েছে। হেডমাস্টারের জবানীতে তাই রেলসম্প্রসারণে জনসাধারণের দুরবস্থার দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "... মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে মানুষ আমি, আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিসপত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেত, এখন থোড়, মোচা, উঠানের দু-আঁটি শাক পর্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে থাক সাড়ে-আটটার গাড়িতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দুপয়সা আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েচে অপব্যয়-মশাই, দুঃখের কথা বলতে গেলে কি, পয়সা-করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে। আর আপনারাই কি প্রাণ ভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ। এই সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হতো না।"[২০]

শ্রীকান্ত অবশ্য হেডমাস্টারের এই রক্ষণশীল, অপ্রগতিপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছে — "আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না করে যদি বিক্রি হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ।"[২১] শ্রীকান্ত রেল চলাচলের বিরুদ্ধে নয় তবে অহেতুক মজুতদারী ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভারের প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি — "বস্তুত যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবন ধারনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া শৌখিন আবর্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা না জন্মাইয়া পারে না"[২২] হেডমাষ্টার অবশ্য একথা স্বীকার করে নিয়েছেন — "মেহন্নতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত

© Santiniketan Sahityapath

হয়েছে।"[২৩] তবে বিদেশিদের দ্বারা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে যখন দেশের অন্ন বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে, তখন বিদেশিদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নতি তখন নামমাত্র — তাঁর কাছে এও একধরনের অপচয়। জীবন সংগ্রাম অর্থ দিয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই। "... চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জনকতক উদ্যমহীন, উপার্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা পাশা খেলে, মড়াপুড়িয়ে, বড় লোকেদের আড্ডায় গান-বাজনা করে, বারোয়ারী তলায় মোড়লি করে, আরও এমনি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্নসংস্থান থাকত তা নয়, তবুও অনেকেরই উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে দু:খে দিন চলে যেত। আপনাদের অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের পরেই ত? যাক চিন্তার হেতু নেই, এইসব অলস, অকেজো পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে। কারণ, উদ্বৃত্ত বলেও আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং হয় অন্নাভাবে মরচে, না হয় কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্যবৃত্তিতে ভর্তি হয়ে জীবন্মৃত ভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে।... জীবন সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে।"[২৪] এই আত্মোপলব্ধি শুধু হেডমাস্টারের নয় বর্তমানে প্রতিটি মানুষেরও। জীবনসংগ্রামের চাপে অহেতুক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানুষ বড়ো যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সহজ সরল জীবনের আনন্দটুকু আজ যেন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে।

'শ্রীকান্ত'র ৩য় পর্বেই মামুদপুর থেকে গঙ্গামাটিতে ফেরার পথে শ্রীকান্ত এক অচেনা গাঁয়ের শেষ সীমান্তে একজন অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানে ব্রাহ্মণ সমাজে অগ্রদানী সম্প্রদায়ের দুর্দশার চিত্রটি তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তীকালে এই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিয়েই তারাশঙ্করের বিখ্যাত ছোটগল্প 'অগ্রদানী' রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এই সম্প্রদায় সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিলেন — "ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতিকে সহস্রগুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনা দোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন।"[২৫] অগ্রদানী পতিত ব্রাহ্মণদের বলা হতো যারা শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ড খেত। তাই সমাজে এদের একপ্রকার একঘরে করেই রাখা হতো। "পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে, তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়।"[২৬] সমাজে এভাবে পৃথক করে রাখা তাছাড়া সমস্ত প্রকার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করা অগ্রদানী ব্রাহ্মণের প্রতি এই জুলুম শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। শ্রীকান্তের সঙ্গে যে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচয় হয়েছিল তাদের "পূর্বে অবস্থা স্বচ্ছল ছিল জমিজমাও মন্দ ছিল না।"[২৭] কিন্তু গ্রামের লোকেরা ঋণ চেয়ে পরিশোধ করতো না ফলে এই সহজ সরল ব্রাহ্মণ পরিবারটি প্রতারিত হয়ে ক্রমশ দরিদ্র হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী অবশ্য চারিত্রিক আদর্শে অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তি। তবে তিনিও দরিদ্র। যেহেতু এই ব্রাহ্মণেরা সমাজের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বাদে সমস্ত ধরনের ক্রিয়ানুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হতেন তাই তাঁদের উপার্জন ছিল নামমাত্রই। সমাজে পুরোহিতের বায়না উচ্চসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরাই পেতেন, এঁরা তাই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে ব্রাত্যই থাকতেন। তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পে ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী আবার কোনো ধনীগৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের অনুষ্ঠান হলে তার খবরাখবর গ্রাম-গ্রামান্তরের সমস্ত ব্রাহ্মণগৃহে গিয়ে বলে আসত। এর বিনিময়ে তার পারিশ্রমিক ছিল বাড়ির জন্য গামছায় করে ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাওয়া। এই ছাঁদা বাঁধা প্রসঙ্গটি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও রয়েছে।

'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বের চোদ্দটি পরিচ্ছেদে রয়েছে পুঁটুর বিবাহের বিবরণ, শ্রীকান্তর বাল্যবন্ধু গহরের হৃদয়ের বেদনার কথা। এখানে এসেছে আর এক বিস্ময়কর নারী কমললতা। তার বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ আঁটসাঁট ছিপছিপে চেহারা। বৈষ্ণবীয় বেশে তার রহস্যময়তা পাঠকদের মুগ্ধ করে। এখানে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত শ্রীকান্ত দ্বিধাগ্রস্ত; কখনো সে রাজলক্ষ্মীর প্রেমে, কখনো আবার কমললতার প্রেমে আচ্ছন্ন থেকেছে। কমললতা দ্বারিকা দেভো আখড়াতে বসবাস করতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতেন। গহর মিয়া একজন দরিদ্র মুসলিম গায়ক। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গান লিখতেন। তিনি আখড়ায় এসে দ্বারিকার সঙ্গে তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানেই ক্রমশ গহর কমললতার প্রেমে পড়েন। এই সময়ে শ্রীকান্ত আখড়ায় থাকতে এসেছিলেন। কমললতা শ্রীকান্তের জন্য রান্নার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এখানেই কমললতা শ্রীকান্তের প্রেমে পড়েন। শ্রীকান্তর কাছে তিনি অতীতের গল্প বলেন যে, তিনি একজন জমিদারের মেয়ে। শৈশবে, তিনি একজন ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে করেন তাঁর নামও ছিল শ্রীকান্ত; যিনি মারা যান। এরপর কমললতা কলকাতায় বিধবার জীবনযাপন শুরু করেন। এখানে এক ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং ঘটনাক্রমে কমললতা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। ম্যানেজার তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে তিনি তাঁর নাম ঊষাঙ্গিনী থেকে পরিবর্তন করে কমললতা রাখেন। সেই সময় থেকেই তিনি বৈষ্ণবী। এরপর শ্রীকান্ত কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। কমললতার গহরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার

জন্য তাকে দোষারোপ করে আখড়া থেকে দূরে পাঠানোর সিধান্ত হয়। শ্রীকান্ত ফিরে এসে সব কিছু জানতে পারেন। তিনি কমললতাকে সঙ্গো নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমললতা যেতে রাজি হন নি। কমললতা এরপর বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। সব শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, বোহেমিয়ান শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্র এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট যোগসূত্র থাকলেও 'শ্রীকান্ত' শিল্পী শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ আত্মজীবনী নয়।

তথ্যসূত্র:

১। 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৬০

২। 'উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস', নারায়ণ চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, কলিকাতা বিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা, ১৯৭৬, মে ১৯৮০, পৃ. ১-২

৩। 'শরৎ সাহিত্যে ব্যাক্তি ও সমাজ', জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০৬, পৃ. ১১

৪। ওই, পৃ. ৫-৬

৫। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয় কলকাতা, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭, পৃ. ৮৬

৬। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ১ম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

৭। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ২য় খণ্ড, 'বিলাসী', রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, কলকাতা বইমেলা ১৪১৪ পৃ. ৯৩১

৮। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭, পৃ. ৮৮

৯। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ১ম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৩৯২

১০। 'জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র', অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ৫০

১১। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ১ম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৪২৮

১২। ওই, পৃ. ৪৭৮

১৩। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ১ম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৪৮৮

১৪। ওই, পৃ. ৪৮৮

১৫। 'শরৎ রচনা সমগ্র', ১ম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৫২২

১৬। ওই, পৃ. ৫২৩

১৭। ওই, পৃ.৫১৯

১৮। ওই, পৃ.৫৬৩

১৯। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয় কলকাতা, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭, পৃ.১০৮

২০। 'শরৎ রচনা সমগ্র', প্রথম খণ্ড, 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬

২১। ওই, পৃ. ৫৬৬

২২। ওই

২৩। ওই, পৃ. ৫৬৭

২৪। ওই, পৃ. ৫৬৭

২৫। ওই, পৃ. ৫৭৫

২৬। ওই

২৭। ওই

—

© Santiniketan Sahityapath